শ্রমিক আন্দোলনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে

১৯৬৭ সালে জনগণের রায়ে পশ্চিমবঙ্গে বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় তা হচ্ছে — বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি জনমুখী সরকারের ক্ষেত্রে শাসন পরিচালনার নির্ধারক নীতি কী হবে। এস ইউ সি আই-এর সুদৃঢ় প্রস্তাব ও চাপের ফলে এই যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল — "ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ চলবে না।" এরই অনুসরণে শ্রমনীতি ঘোষণা করে বলা হয়েছিল — ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, সি পি আই(এম) সহ যুক্তফ্রন্টের আরও কয়েকটি শরিক দল এই নীতির তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে সংকীর্ণ স্বার্থে তার অপব্যবহার ঘটায়, যার ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সামনে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই পটভূমিকায় সরকার গঠনের কয়েক মাস পরে, পশ্চিমবঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রদত্ত এই ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী এই শ্রমনীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দেখান যে, এর উদ্দেশ্য হ'ল গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামগুলিকে পুঁজিবাদ উৎখাতের অন্তিম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া — যাতে করে এর মধ্য দিয়ে সমগ্র দুনিয়ার বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কাছে এমন এক বুনিয়াদি সঞ্চালক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা যায় — যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে একটি প্রকৃত জনমুখী সরকারকে পথ দেখাতে পারে যাতে সে সরকারি ক্ষমতার যথাযথ সদ্ব্যবহার করে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলিকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করতে পারে এবং সেগুলি গড়ে ওঠার ও বিকাশের ব্যাপকতম সুযোগ করে দিতে পারে। ভাষণ প্রসঙ্গে কমরেড ঘোষ এটাও দেখান যে, এই নীতি গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর উপর নতুন দায়িত্বও বর্তেছে। আজ তাদের অতি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, এই নীতির ফলে একটি বিপ্লবাত্মক সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীকে তাই সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং সংগ্রামকে অর্থনীতিবাদ, কানুনি জটিলতা ও সংস্কারবাদের সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে।

কমরেড সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক ভাইসব ও উপস্থিত বন্ধুগণ,

আজকের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এই বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে কিছু বলবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার পর যে প্রগতিশীল শ্রমনীতি গ্রহণ করেছে, বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পটভূমিকায় তার যথার্থ তাৎপর্য এবং সাধারণ মানুষ বিশেষ করে খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের সামনে এই অবস্থায় কী করণীয়, সে সম্পর্কে আমি এই সম্মেলনে আপনাদের সামনে সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করব।

প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, এরকম জাঁকজমক করে সম্মেলন আগেও হয়েছে, এর চেয়ে বড় আকারেও হয়েছে, বহু প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। নেতাদের বক্তৃতা শুনে অনেক হাততালি আপনারা দিয়েছেন, উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন, সংগঠনের মনোভাব, লড়াইয়ের দৃঢ়সংকল্প বহুবার বহুরকমভাবে আপনারা ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের সম্মেলন, দাবিদাওয়া আদায় নিয়ে লড়াই আপনারা বহুদিন যাবৎ করে আসছেন। আপনাদের ত্যাগ করবার, লড়াই করবার যে শক্তি-সামর্থ্য আছে তাও আপনারা অনেকবার দেখিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের অবস্থা পূর্বে যা ছিল, এত সব কাণ্ডের পরেও মূলত তাই আছে, বিশেষ কিছু পাল্টায়নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার পূর্বে শোষণব্যবস্থার চাপে পিষ্ট যে শ্রমিক আপনারা ছিলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও তার প্রগতিশীল শ্রমনীতি প্রভৃতি সত্ত্বেও আপনারা সেই শোষিত, অত্যাচারিত শ্রমিকশ্রেণীই আছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথচ মালিকশ্রেণী নেই, তাদের শোষণ নেই, জুলুম নেই, ছাঁটাই নেই, লে-অফ নেই, কোনও অত্যাচার নেই, চাকরির অনিশ্চয়তা নেই — অবস্থাটা কি এরকম? যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কি এসব পাল্টে গিয়েছে, না পাল্টে যাওয়া সম্ভব?

এতদিন পর্যন্ত আপনাদের ধারণা ছিল, বা আপনাদের মধ্যে ধারণা সঞ্চারিত করা হয়েছে এবং আজও করা হচ্ছে যে, এদেশে যখন 'অ্যাডাল্ট ফ্রেঞ্চাইস' (প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার) অর্থাৎ আপনাদের ভোট দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তখন আর বিপ্লবের প্রয়োজন কী? কংগ্রেসিরা, পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের তাঁবেদাররা এবং ইলেকশন রাজনীতির প্রভাবে মোহগ্রস্ত একদল লোক ক্রমাগত আপনাদের বিচারবুদ্ধিকে বিপথে পরিচালিত করার হীন উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রচার করে থাকে যে, যেহেতু জনসাধারণের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং ভোটের মাধ্যমে ইচ্ছা করলেই যেখানে জনসাধারণ মনোমতো সরকার গঠন করতে পারে এবং সেই সরকারের জনস্বার্থের অনুকূলে প্রয়োজনমতো আইনকানুন পাল্টাবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে; পুলিশ, মিলিটারি, ব্যুরোক্রেসি প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্থায়ী শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামগুলি গড়ে তোলবার কোন সার্থকতা নেই, বিপ্লবী মতাদর্শের প্রয়োজনীয়তা নাকি আর নেই। এই কথাগুলো পুঁজিপতিশ্রেণীর দালালরা নিয়ত আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করছে। ওরা প্রচার করছে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার থাকা সত্ত্বেও যারা বিপ্লবের কথা বলে তারা নাকি অহেতুক দেশের অভ্যন্তরে একটা গৃহযুদ্ধ বাধাতে চায়, দেশের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায়, দেশের অব্যাহত অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করতে চায় — বিদেশি বুক্নি, বিদেশি তত্ত্ব, বিদেশি বুলির ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়। আর এইসব যারা করতে চায় তারাই নাকি বিপ্লবের কথা বলে। এটা একটা ডাহা মিথ্যা। এই সব বক্তব্যের আড়ালে যে আসল সত্যটিকে জনসাধারণের সামনে চেপে রাখবার চেষ্টা প্রতিক্রিয়াশীলরা করে থাকে আজ সেই সত্যটিকে আপনাদের উদ্‌ঘাটিত করতে হবে, এই মিথ্যা প্রচারের মুখোশ আপনাদের খুলে দিতে হবে। আজ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার মধ্য দিয়ে এই ধরনের প্রচার যে কতবড় ধোঁকাবাজি এবং মিথ্যাচার বাস্তবে তা প্রমাণ হতে চলেছে। এই কথাগুলো সত্য অথবা মিথ্যা তার একটা বাস্তব পরীক্ষা হচ্ছে আজকের নতুন পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আমি দেখাতে চাইছি, এই তো আপনাদের মনোমতো যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার গঠন হওয়ার ফলে কি আপনাদের জীবনের মূল সমস্যা যেগুলো ছিল তা দূর হয়ে গেছে, নাকি এই সরকারের পক্ষে ইচ্ছে থাকলেই শুধু আইন পাল্টে সেই সমস্ত মূল সমস্যা দূর করে দেওয়া সম্ভব? আপনাদের বোঝা উচিত যে তা সম্ভব নয়। তাহলে কি শ্রমিকদের স্বার্থে এই যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের কোন তাৎপর্য নেই? আমি মনে করি আছে। পুঁজিবাদী সংবিধান ও আইনের পৃষ্ঠপোষকতায় মালিকশ্রেণীর যে শোষণ ও অত্যাচার অব্যাহত গতিতে চলছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করবার তাদের ঘোষিত নীতি বলিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে তাহলে শোষণ থেকে মুক্তি এনে দিতে না পারলেও শোষণমুক্তির আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থে এর তাৎপর্য আছে। সে কথা আমি পরে আলোচনা করছি।

এখন দেখা যাক, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর আজও দেশের মূল অবস্থা কী? আজও শ্রমিকদের চাকরির স্থায়িত্ব নেই, শ্রমিকরা যে সম্পদ তৈরি করে, উৎপাদনের পেছনে যে পরিশ্রম তারা করে তার ন্যায়সঙ্গত মূল্য তারা পায় না। তাদের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদের ওপর একদল পরগাছা জীব আমিরি করে বেড়াচ্ছে। তারাই ক্ষমতাবান, তারাই প্রভাবশালী, তারাই সম্মানিত ব্যক্তি। এমনকী তাদের একজনের প্রতিবাদও কাগজে ফলাও করে ছাপানো হয়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ যারা দেশের সম্পদ গড়ে তুলছে তাদের হাজার লোকের বুকফাটা কান্নার কথাও কাগজে বেরোয় না। কিন্তু শ্রমিকদের তৈরি সম্পদের ওপর পরগাছার মতো আমিরি করে অনেকটা অসভ্য জানোয়ারের জীবনযাপন করে যারা, তারা একটা কথা বললে সে সম্বন্ধে সারা দেশ জুড়ে একটা আলোড়ন পড়ে যায়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের অন্তরের কথা কী, সত্যিকারের প্রয়োজন কী, যথার্থ চাহিদা কী, তারা কী বলছে — তাকে রূপ দেওয়ার জন্য দেশে কাগজ নেই। পুঁজিপতিশ্রেণী বা তাদের তাঁবেদার সম্প্রদায় মজুরের বুকের এই ব্যথা এবং তাদের সত্যিকারের প্রয়োজন সম্পর্কে যে কোন গুরুত্ব দিতে চাইবে না — এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেশের যারা বুদ্ধিজীবী, মধ্যবর্তী বিরাট জনসাধারণ, তাদের চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়েও মজুরের চাহিদার প্রতি কোন দায়িত্ববোধ, কোনও গুরুত্ব, শ্রমের প্রতি যথার্থ সম্মানবোধ আজও সৃষ্টি হয়নি। অনেক কিছু পড়াশুনা করে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় শুধু মিথ্যা 'ইগো'র (অহম্-এর) বোঝাই ভারি করে তুলছেন। মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের প্রতি তাঁদের এই মনোভাব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টির পেছনে যে দস্যুতা ও জুলুমের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে তার হদিশ তাঁরা আজও

পাননি। আজও দেশের মানসিকতা এভাবে সৃষ্টি হয়নি যে, এই যে মানুষগুলো, লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের পরিশ্রমের ফলে সম্পদ গড়ে উঠেছে, সভ্যতা গড়ে উঠেছে, আর যে সম্পদের ওপর আমরা গর্ব করি, যে সভ্যতার ওপর আমরা গর্ব করে থাকি তা মজুররাই সৃষ্টি করে — মালিকরা নয়। যে উৎপাদন বাড়লে জাতির উন্নতি হবে বলছি সেই উৎপাদনও বাস্তবে মজুররাই সৃষ্টি করে, মালিকরা নয়। আজও করছে, কালও যদি উৎপাদন বাড়ে, তারাই করবে। মালিকের টাকার জন্য উৎপাদন হয় না, বরঞ্চ মজুরের পরিশ্রমের ফলে যে উৎপাদন হয় সেই উৎপাদন থেকে অর্জিত সম্পদ মজুরদের ফাঁকি দিয়ে মালিকের ঘরে টাকা জমছে। সেই মজুরের মর্মবেদনা কী, সেই মজুরের জীবনের সামনে মূল সমস্যা কী, গোটা সমাজের অগ্রগতি প্রগতির স্বার্থেই তাকে বোঝবার দরকার আছে। কিন্তু তাকে প্রতিফলিত করার কোন যন্ত্র, দেশজোড়া এমন কোন শক্তিশালী অস্ত্র অর্থাৎ সংগঠন আজও দেশে গড়ে ওঠেনি। আর তা নেই বলেই মালিকরা তুচ্ছ কথা নিয়ে যখন তখন হট্টগোল বাধায়। পাঁচটা মালিক যে মনোভাব প্রকাশ করছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্রমিক জনসাধারণের সঙ্গে সে মনোভাবের কোন সংযোগ নেই — তারা একটা সম্পূর্ণ পাল্টা মনোভাবকে প্রতিফলিত করছে। অথচ সেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্রমিকের মনোভাবের প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে, ঐ পাঁচটা মালিকের যে চিৎকার তাকেই কাগজগুলোর মারফত সোচ্চারে প্রচার করা হচ্ছে, তার ওপরে হট্টগোল করা হচ্ছে, তার ওপরে যত যুক্তি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হচ্ছে।

এই যে জিনিসটা সমাজে চলছে আপনারা দেখছেন, তার কারণ গোটা সমাজের মানসিকতা এইভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু কেন? কারণ আমাদের বর্তমান যে সমাজ, এ সমাজ পুঁজিপতিদের তাঁবেদার সমাজ, তাদের পৃষ্ঠপোষক সমাজ। এর সমস্ত কিছু তাদের সেবা করতে বাধ্য, না করলে কারোর চলবার উপায় নেই। হয় এই ব্যবস্থার সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে, সাহসের সাথে লড়তে হবে, নয় যেভাবেই হোক্ এর দাসত্ব করে চলতে হবে। ধরুন, যারা সংবাদপত্র চালায় তাদের সমস্যা হচ্ছে যে, মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা না করলে কাগজ চলবে না। কারণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তাকে ফলাও করে মালিকের কথা বলতে হবে। আর যারা সংবাদপত্রে কাজ করে, চাকরির স্বার্থে প্রতিদিন তাদের মালিকের স্বার্থের পায়ে নিজেদের বিকিয়ে দিতে হচ্ছে। এমনকী ইলেকশনের মধ্য দিয়ে সরকারের গদিতে যাঁরা বসেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে এইভাবে ভেবে থাকেন যে, যদি মালিকের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা না করেন তাহলে সরকারি গদিতে তাঁদের থাকবার উপায় নেই, তাঁরা বেশিদিন থাকতে পারবেন না। ফলে দেখা যায়, এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসি সরকার তার আচরণ, তার কর্ম, তার ব্যবহার, তার চিন্তা, সমস্ত কিছুর দ্বারা এই পুঁজিবাদী সমাজটাকেই সেবা করে এসেছে। আর এই পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবার নাম দেশসেবা দিয়েছে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে রচিত পরিকল্পনাগুলোকে দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা বলেছে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের পায়ে মজুরের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার নাম দিয়েছে দেশের স্বার্থে মজুরের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া, ব্যক্তির স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। আমি মনে করি, এই মিথ্যাচারটি সর্বপ্রথমে দূর হওয়া দরকার।

এখন দেশের এই যে বর্তমান অবস্থা তার মধ্যে আপনাদের আন্দোলনের, লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য কী হবে? আপনারা কার বিরুদ্ধে লড়বেন, কেন লড়বেন এবং কীভাবে লড়বেন? সে লড়াইয়ের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কী হবে? আপনাদের স্পষ্ট করে বুঝতে হবে, কী আপনারা চান যাতে শেষ পর্যন্ত আপনাদের মৌলিক অবস্থার, মূল সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে? সেটা কি শুধু দৈনন্দিন দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করা? আমি বলি, এ তো আছেই, কিন্তু এটাই লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। গত ৪০ বছর যাবৎ ভারতবর্ষের শ্রমিক মাইনে বাড়াবার জন্য, আইনকানুন পাল্টাবার জন্য, অধিকার বাড়াবার জন্য লড়াই করে আসছে। অধিকার আপনারা কিছু কিছু অর্জনও করেছেন। এর কোনও তাৎপর্য নেই, একথা আমি বলছি না। এর যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। কিন্তু সে তাৎপর্য শুধু একটাই। তা হচ্ছে এই অধিকারগুলো ব্যবহার করে দৈনন্দিন গণআন্দোলনগুলো শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে এমন অমোঘ বিপ্লবী সংগঠনশক্তি গড়ে তোলা যাতে একদিন এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করে শোষণহীন শ্রমিকশ্রেণীর রাজ কায়েম করা সম্ভব হয়। কিন্তু সে যদি না হয়, শুধু দু'চার-পাঁচ টাকা মাইনে বাড়ানোই যদি আপনাদের আন্দোলনের বা লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে শ্রমিক আন্দোলনে এক ধরনের সুবিধাবাদের জন্ম হতে বাধ্য, এবং আপনারা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী মনোভাবকে এই সুবিধাবাদ ইতিমধ্যেই অনেকাংশে গ্রাস করে ফেলেছে।

শ্রমিক আন্দোলনে এই সুবিধাবাদের অনুপ্রবেশই আপনাদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব গড়ে তুলছে যে, যে সমস্ত নেতাদের ধরলে তাঁরা মালিকদের কাছ থেকে এ ধরনের সুবিধা আপনাদের আদায় করে দিতে পারবেন, আপনারা তাঁদের পেছনেই চলবেন। আর এইভাবে যদি চলতে থাকেন তাহলে আপনাদের এই দুর্ভাগ্য কেউ পাল্টাতে পারবে না, স্বয়ং ঈশ্বরও পাল্টাতে পারবে না। ঈশ্বরেরও ক্ষমতা নেই যে আপনাদের দুর্ভাগ্য পাল্টাতে পারে। তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক সংঘশক্তি কোনদিনই গড়ে উঠবে না এবং পুঁজিবাদী শোষণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি কোনদিনই অর্জিত হবে না।

ফলে এ রাস্তা ছাড়তে হবে। আপনাদের দুর্ভাগ্য একমাত্র পাল্টে যেতে পারে যদি আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের প্রকৃত মুক্তির প্রশ্নটা ভারতবর্ষের গোটা সমাজব্যবস্থাকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আঘাতে পরিবর্তিত করার মধ্যেই নিহিত। আর এ পরিবর্তনটা শুধু মাঠে ঘাটে 'এটা চাই' 'ওটা চাই' করে চিৎকার করলেই হয় না। সুনির্দিষ্ট ও সচেতন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও সম্প্রসারণ এবং দাবিদাওয়া আদায় করার জন্য লড়াই করার অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই খানিকটা সুযোগসুবিধা অর্জন। পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদের কোন বাস্তব ও সর্বাত্মক পরিকল্পনা না নিয়ে শুধুমাত্র আইনকানুন পাল্টানো ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের লড়াই পরিচালনা করার অর্থ দাঁড়ায় যে, শোষণটা যেমন চলছে তেমনি চলুক, যেমন গোলাম হয়ে আপনারা রয়েছেন তেমন গোলাম হয়েই থাকতে আপনারা রাজি, তাতে আপনাদের আপত্তি নেই, তাতে আপনাদের আত্মসম্মানে লাগবে না, আপনারা পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন করতে চান না — শুধু শোষণের জ্বালাটা একটু কমানো, একটু মোলায়েম করাই আপনাদের আন্দোলনগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এর ফলে মালিক মালিকই থাকছে, আপনি মজুর মজুরই থাকছেন, আপনাকে শোষণ করার তার পুরো অধিকার থাকছে, এবং সামাজিক উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকছে, উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনই থাকছে। এই অবস্থা যদি থাকে তাহলে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে কোনদিন শ্রমিকের মুক্তি অর্জিত হতে পারে না।

এখানে আর একটা কথাও আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে। আপনারা উৎপাদন করেন সমাজের জন্য। অথচ আপনাদের বোঝানো হয় যে, আপনারা যে কাজ করেন তা নিজেদের পেটের জন্য এবং আপনাদের এই যে ভরণপোষণের উপায় ও দেশের উন্নতির জন্যই নাকি মালিকরা কলকারখানা এবং উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এটা একটা নির্জলা মিথ্যা কথা। আপনাদের আজ এটা বুঝতেই হবে, আপনার পরিশ্রম আজ মূলত আপনার ভোগের জন্য নয়, যদিও প্রত্যেক মানুষের পরিশ্রমের পিছনে একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিক আছে। আজকে আপনাদের পরিশ্রমের চরিত্রটা হয়ে পড়েছে সামাজিক। আপনি কাজ করেন সমাজের জন্য। আপনার পরিশ্রম থেকে যে উৎপাদন হয় তার চরিত্র সামাজিক। তা সমাজের ভোগে লাগে তাই সভ্যতার ক্রমবিকাশ হচ্ছে, দেশের উন্নতি হচ্ছে। ফলে আপনার সমস্ত পরিশ্রমই দেশের উন্নতির জন্য। ফলে আপনি যে পরিশ্রম করছেন এবং সেই পরিশ্রম করার বদলে আপনার বেঁচে থাকবার জন্য মজুরি হিসাবে আপনি যা পাচ্ছেন সেটা সমাজেরই দেওয়ার কথা। কিন্তু সমাজের বদলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকার দরুন সেটা দিচ্ছে মালিকশ্রেণী। ফলে ব্যক্তি মালিক আপনাকে ততটুকু দিচ্ছে যতটুকু না হলে আপনি বেঁচে থেকে তার শোষণের, তার মুনাফার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারেন না। ন্যূনতম যতটুকু হলে আপনি খেয়ে পরে বেঁচে থেকে আপনার দৈহিক পেশীকে ঠিক রেখে মজুর হিসাবে অর্থাৎ মালিকের মুনাফা অর্জনের শিকার বা যন্ত্র হিসাবে পরিণত হতে পারেন, ঠিক ততটুকু মজুরি তারা আপনাকে দিচ্ছে, আর আপনার পরিশ্রম থেকে উদ্ভূত বাকি সমস্ত সম্পদ ব্যক্তিগত মুনাফা হিসাবে মালিকরা আত্মসাৎ করছে। ফলে এ ব্যবস্থায় কোন সচেতন মজুরই সামাজিক ন্যায়বিচার আশা করতে পারে না। এখানে মালিকের কাছে শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজনের ধারণাটা কী? একটা মজুরের বেঁচে থাকার প্রশ্নে যখন ন্যায়বিচারের কথা ওঠে স্বভাবতঃই তখন বলা হয় যে, মজুরকে এমন কিছু দাও ন্যূনতমপক্ষে যা ন্যায়সঙ্গত এবং মানবিক। কিন্তু এই মালিকি ব্যবস্থায় মালিকের কাছে এই ন্যায় ও মানবিকতার ধারণা কী? এখানে মালিকের কাছে মানবিকতার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, যেটুকু না হলে মজুরের পক্ষে বেঁচে থেকে দৈহিক পেশী সঞ্চালন করাই মুশকিল, মালিকের কারখানায় মেশিন চালানোই মুশকিল, তার মুনাফা অর্জন করে দেওয়াই মুশকিল, ততটুকু দেওয়াই তাদের কাছে মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত।

এখন বর্তমান অবস্থায় মালিকরা শ্রমিকের মজুরির ন্যায্য মূল্য দেওয়া তো দূরের কথা যখন এই ন্যূনতম

প্রয়োজন থেকেও বঞ্চি ত করছে, তখন বেঁচে থাকতে হলে মজুরদের সামনে ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলির ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই। আর যে ঘেরাও নিয়ে বর্তমানে এত হৈচৈ করা হচ্ছে সেই ঘেরাও হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন 'ফর্মে'র (রূপের) মধ্যে একটি রূপ মাত্র, যা বাস্তব অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এদেশের গণআন্দোলনের একটি ধারা হিসাবে গড়ে উঠেছে। টাটা বলেছে, ঘেরাও হচ্ছে জঙ্গলের আইন। আমি বলি, তাহলে যে আইনে তোমরা মালিকরা উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করছো তা হচ্ছে গভীর জঙ্গলের আইন। শ্রমিকরা যে ঘেরাও করে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা — অপরকে শোষণ করা নয়। আর মালিকদের অধিকারগুলো হচ্ছে, মানুষ এবং মানবতার আদর্শকে পায়ে মাড়িয়ে নিংড়ে তার রসকে ব্যক্তিগত সুবিধার কাজে ব্যবহার করা। অথচ একেই তারা বলছে সভ্যতা, আর ঘেরাওকে বলছে জঙ্গলের আইন। ঘেরাও যদি জঙ্গলের আইন হয়, তাহলে মজুর ছাঁটাই করার মালিকদের অবাধ অধিকার, অর্থাৎ যে আইনে মালিকদের 'আন্‌ফেটারড রাইট অব রিট্রেঞ্চ মেন্ট উইদাউট গিভিং প্রোটেকশন ফর রাইট টু ওয়ার্ক' (মজুরকে চাকরির কোনরূপ কার্যকরী নিশ্চয়তা না দিয়ে মালিকের ছাঁটাই-বরখাস্তের একতরফা নিরঙ্কুশ অধিকার) দেওয়া হয়েছে তা গভীর জঙ্গলের আইন। তা 'আন্‌সিভিলাইজ্‌ড্‌, প্রিমিটিভ ইন নেচার, টরচারাস্‌ ইন নেচার' (অসভ্য, প্রকৃতিতে আদিম এবং অত্যাচারী)। মজুরদের ঘেরাও আন্দোলনের নিন্দা করার পূর্বে তাকে পরিবর্তন করতে হবে। শ্রমিক শখে ঘেরাও করে না। তারা দিনরাত পরিশ্রম করে, আর পরিশ্রম করে গোটা দেশের ও সমাজের জন্য। অথচ সেই শ্রমিকের ন্যূনতম স্বার্থকেও রক্ষা করার দিকে ঘেরাও-বিরোধী আন্দোলনের উমেদারদের নজর নেই। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার ব্যবস্থা হলে ঘেরাও করার তাদের দরকার হবে না। যতক্ষণ তাদের স্বার্থকে রক্ষা না করা হচ্ছে তারা তাদের অধিকার আদায় করবেই। আইন যদি সাহায্য করার বদলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে প্রয়োজন মতো আইনের বিরুদ্ধে গিয়েও 'কজ অব হিউম্যান জাস্টিস'কে (মানবিক ন্যায়বিচারের আদর্শকে) তারা উচ্চে তুলে ধরবে, দরকার হলে আইনকে পরিবর্তিত করতে বাধ্য করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই শ্রমিক আন্দোলনগুলোকে বিচার করতে হবে। সরকারের গদিতে বসে সরকারি কর্তারা কী করবেন তা তাদের বিচার্য বিষয়। কিন্তু সত্যিকারের দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক জনসাধারণের মনের ভাবটা হওয়া উচিত এইরকম এবং এইটা বুঝেই তাদের বর্তমান আন্দোলনগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে হবে।

আর শ্রমিকদের বোঝা দরকার যে, শুধু সরকারি যন্ত্রের সুযোগ নেওয়াই তাদের কাজ নয়। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা যে লড়াই করবে সে লড়াই বেশি দিন টেকে না। সরকার গুঁতো দিলে আর লড়াই থাকবে না। আজ সরকার গুঁতো দিচ্ছে না, লড়াই দানা বাঁধছে। কাল সরকার গুঁতো দিতে শুরু করলে লড়াই ভেঙে যাবে। তাই রাজনৈতিক চেতনা অর্জন ও লৌহদৃঢ় সংঘশক্তি সমস্ত লড়াইয়ের একটা অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। মজুরের দুর্দশার ইতিহাস, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মূল সমস্যা — এগুলো নিয়ে মজুরদের মাথা ঘামাতে হবে। বুঝতে হবে যে, গোটা ভারতবর্ষে সরকার পাল্‌টানো, আইন-কানুন পাল্‌টানো, আর ঘেরাওতে পুলিশ যাবে কি যাবে না — শুধু এতে শ্রমিকের মুখ্য লাভ কিছু নেই। শ্রমিকের মূল মুক্তির লড়াই সংগঠিত করার কাজে যদি তাঁরা একে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন তবেই একমাত্র সাময়িকভাবে হলেও এর একটা বিরাট মূল্য আছে। আর এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই বামপন্থী সরকার গঠিত হলে যাতে গণআন্দোলনগুলিকে পুলিশি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা যায় তার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই নির্বাচনের বহু আগে থেকেই লড়াই করে আসছিল।

আর একটা কথা দেশের মানুষকে ভেবে দেখতে হবে। 'আইনের চোখে সবাই সমান' — এটা কাগজে-কলমে লেখা আছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে আইনকে ব্যবহার করা হয় মজুর পেটাবার অস্ত্র হিসাবে, মালিকের স্বার্থে। কাজেই বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে 'আইন সবার জন্য সমান' — এই কথাটিকে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ছাত্ররা, বিপ্লবীরা বলি, এটা একটা অত্যন্ত মিষ্টি কথা — মানে মিষ্টি অথচ নির্জলা মিথ্যা কথা। এখানে 'ল প্রিটেন্‌ডস্‌ টু বি ইক্যুয়াল বাট ইন অ্যাকচুয়ালিটি ইট ইজ নট ইক্যুয়াল ফর অল পিপল। ইট সেফগার্ডস দি ইন্‌টারেস্ট অব দ্য ক্যাপিটালিস্টস'। (আইন সবার জন্য সমান — এইটা এ সমাজে দেখানো হয়, কিন্তু বাস্তবে আইন সবার জন্য সমান নয়। এ সমাজে আইন পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে)। অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আইন শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য। কাজেই 'আইনের চোখে সবাই সমান' — এটা আইনের শ্রেণীচরিত্র চেপে রেখে সাধারণ মানুষকে ভাঁওতা দেওয়ার একটা বুর্জোয়া চালাকি

মাত্র। এ কথা যাঁরা বুঝতে চান না তাঁরাই পুঁজিবাদী সমাজে 'জুডিসিয়ারি'র শ্রেণীচরিত্র আড়াল করে জনমতকে বিভ্রান্ত করার হীন উদ্দেশ্যে প্রচার করে চলেছেন যে, জুডিসিয়ারি নাকি 'কাস্টডিয়ান অব জাস্টিস অ্যান্ড পাবলিক কনসেন্স', অর্থাৎ ন্যায়বিচার এবং জনসাধারণের বিবেকের অভিভাবক। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 'পাবলিক কনসেন্স' বা জনগণের বিবেকও শ্রেণীর ঊর্ধ্বে বা শ্রেণী-নিরপেক্ষ বিবেক হতে পারে না, তা কোন না কোন শ্রেণীচিন্তারই প্রতিফলন মাত্র।

ঠিক একইরকমভাবে বলা হয়ে থাকে, পুলিশও নাকি 'নিউট্রাল'। কিন্তু একজন পয়সাওয়ালা লোক থানায় গেলে দেখবেন তার কত খাতির, কত 'ওয়েট'। তার একটা ফালতু চার্জ-এর ওপর কত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর আপনি সাধারণ মানুষ, আপনার জীবন জেরবার হয়ে যাচ্ছে, আপনার উমেদার নেই, পয়সার জোর নেই, আপনার কথায় কর্ণপাতই কেউ করবে না। সমস্ত ব্যবস্থাটাই এইরকম। প্রতিটি সাধারণ মানুষ প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা উপলব্ধি করছে। কোন মালিক যদি একটা মিথ্যা ডায়েরি করতেও আসে তাহলে থানা অফিসাররা সে সম্বন্ধে অত্যুৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন। আর মালিকের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে মজুর একটা ডায়েরি করতে গেলে, উল্‌টে থানার বড়কর্তারা মালিকদের বিরুদ্ধে ডায়েরি করতে এসেছে বলে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে সেই মজুরকেই লক্‌আপ-এ পুরে দেয় — এমন নজির এদেশে হামেশাই ঘটছে।

আমি এখানে দেশের সাংবাদিকদের একটা কথা বলতে চাই। তাঁরা দেশের 'বড়' 'বড়' সমস্যা নিয়ে লেখেন, অথচ এইসব জিনিসের দিকে একেবারেই নজর দেন না। তাঁরা 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন', 'গণতন্ত্র' 'গণতন্ত্র' বলে হামেশাই চিৎকার করে থাকেন। কিন্তু গণতন্ত্রের আসল প্রাণশক্তি কী? সেকি শুধু খবরের কাগজের লেখা আর পার্লামেন্টের মেম্বারদের বক্তৃতা ছাপানো? না। গণতন্ত্রের আসল শক্তি জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনা এবং গণতান্ত্রিক সংঘবদ্ধতা। সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে যদি রক্ষা করা না যায়, গণতান্ত্রিক সংঘশক্তিকে যদি দানা বাঁধতে না দেওয়া যায়, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ যদি খুলে দেওয়া না যায় তাহলে গণতন্ত্র এমনি মরবে, তাঁরা চিৎকার করলেও মরবে। তাহলে অন্তত বুর্জোয়া অর্থেও এদেশের গণতন্ত্রকে তাঁরা টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। তাই যাঁরা গণতন্ত্রের নামে আইনের শাসনের এত পক্ষপাতী তাঁদের বুঝতে হবে, এই আইনের শাসনও যদি তাঁরা টিকিয়ে রাখতে চান তাহলে শুধু কাগজে লিখে হবে না, সৎসাহসের সঙ্গে সমস্ত ন্যায্য আন্দোলনগুলিকে পৃষ্ঠাপোষকতা করতে হবে। এঁরা কিছুতেই বুঝতে চান না যে, যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা না যায় তাহলে এই 'আইন ও শৃঙ্খলা'র দোহাই দিয়েই যে কোন দিন মিলিটারি এসে নির্বাচিত আইনসভাগুলিকে ভেঙে দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারে — বিশেষ করে জনসংঘ[১], স্বতন্ত্রের[২] মত দলগুলির সমর্থন মিললে তো কথাই নেই। তখন কাগজওয়ালারা পার্লামেন্টারি শাসন রক্ষা করতে পারবেন না। এইরকম দুরবস্থার হাত থেকে দেশকে সেদিন রক্ষা করতে পারে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সংঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক চেতনাই একমাত্র সে অবস্থায় দেশকে রক্ষা করতে পারে। আর এটাই 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গভর্নমেন্টের গণআন্দোলন সংক্রান্ত নীতির ঘোষিত উদ্দেশ্য। যুক্তফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ বন্ধ করার যে নীতি ঘোষণা করেছে তার অর্থ দেশের মানুষ এই সংঘবদ্ধ-চেতনাবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলার, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার একটা সুযোগ পাক, যে সুযোগ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে দ্রুত গণআন্দোলনগুলো এবং গণসংগঠনগুলো গড়ে তোলা আজ অনেক সহজসাধ্য হবে। পুলিশের দাপটে, মালিকদের স্বার্থের দাস হয়ে গিয়ে পুলিশ যেভাবে এতদিন আচরণ করেছে তার জন্য পূর্বে তা করা সম্ভব হয়নি — করবার স্পেস পায়নি, একটা 'ব্রিদিং স্পেস' পায়নি, নিঃশ্বাস নেবারও অবকাশ ছিল না। শ্রমিকরা একটা ইউনিয়ন করতে গেল অমনি ডায়েরি হয়ে গেল। যারা ইউনিয়ন করতে গেল সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছাঁটাই করে বসিয়ে দিল, গোপনে রিপোর্ট নিয়ে তাদের ছাঁটাই করে দিল। তাদের রক্ষা করার কোনও উপায় ছিল না। তাদের রক্ষা করার জন্য দেশে কোন আইন নেই, কোন ব্যবস্থা নেই। পুলিশের কাছে বলা মানে আরেক বিপদ ডেকে আনা। পুলিশের কাছে গিয়ে অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে 'মালিকের বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছিস' — বলে উল্‌টে তাকেই যেকোন একটা চার্জ দিয়ে আটকে রেখে দিত। এই ছিল বাস্তব অবস্থা। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় একটা প্রগতিশীল গভর্নমেন্ট, বামপন্থীদের কথা থাক্, এতটুকু প্রগতিশীল, এতটুকু মানবিক যদি একটা গভর্নমেন্ট হয়, যার চোখ অন্ধ নয়, এবং অন্তত মালিকের দালালি করতে চায় না সে এই অবস্থায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে কী করতে পারে? তার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ

হওয়া উচিত সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, যদি তা ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক হয়, তবে তাকে পুলিশের এই 'আইন ও শৃঙ্খলা'র অজুহাত থেকে, পুলিশের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা।

কিন্তু শ্রমিক সমাজকেও তাদের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুলিশের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার এই যে তাৎপর্য — এটাকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। পুলিশি হস্তক্ষেপ থেকে আন্দোলনগুলোকে রক্ষা করার তাৎপর্য কী? এই রক্ষা করার তাৎপর্য হচ্ছে — বৃহত্তর গণআন্দোলন, পুঁজিবাদবিরোধী গণআন্দোলনের চেতনায় শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করার যে অবকাশ আপনারা পেলেন তাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই অধিকারকে অপব্যবহার করা নয়। তাহলে এর সমস্ত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, বানচাল হয়ে যাবে। যদি হয় কথায় নয় কথায় আপনারা ঘেরাও করেন তাহলে এর যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সেটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাজেই আমি মনে করি, এ অবস্থায় শ্রমিক সমাজকে দু'রকমের আন্দোলন করতে হবে। একটা হচ্ছে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সচেতন সংঘবদ্ধ শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে বর্তমান অবস্থায় নিজেদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলি পরিচালনার সময়ে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিতে হবে। তাদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে, সরকারের ঘোষিত এই নীতি পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, মালিকশ্রেণী, সরকারি আমলাতন্ত্রের এক শক্তিশালী অংশ, এমনকী যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরেও কিছু শক্তির একটা সম্মিলিত চাপ কাজ করছে। এটা যুক্তফ্রন্ট সরকার। সত্য কথাটা আপনাদের সামনে আসা দরকার। এ সরকার একদলীয় সরকার নয়, বা শুধুমাত্র বামপন্থীদের নিয়ে গঠিত একটি বামপন্থী সরকারও নয়। এছাড়া এই সরকার একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে, একটা সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করছে। ফলে এর অনেক অসুবিধা। অনেক কিছু আপনারা আশা করতে পারেন। কিন্তু আশাই শুধু করবেন — এ অসুবিধাগুলোর কথা মনে রাখবেন না, সে সম্বন্ধে কোনও সচেতনতা আপনাদের থাকবে না, কোনও হিসাব আপনাদের থাকবে না তাহলে নিজেদেরই অনিষ্ট করে বসবেন। কীভাবে অনিষ্ট করবেন? না, একদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও তার প্রগতিশীল নীতিগুলি বানচাল করার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের যে চক্রান্ত চলছে সে সম্বন্ধে আপনাদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা ও অন্যদিকে সরকারের প্রগতিশীল নীতির তাৎপর্য না বুঝে, মুখ্য উদ্দেশ্য কী সেইটার দিকে স্থির দৃষ্টি না রেখে 'পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না' — এইটার সুযোগে এমন সব উগ্র আচরণ করতে থাকবেন, ছোটখাট তুচ্ছাতিতুচ্ছ রাগ, ব্যক্তিগত আক্রোশ — যে সমস্ত এতদিন আপনাদের মনের মধ্যে জমে আছে সেইগুলোকে প্রকাশ করতে থাকবেন এবং যে সমস্ত পার্টি এর রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই হোক্ অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যেই হোক্ সাময়িক সংগঠন বৃদ্ধির হীন সংকীর্ণ পার্টি স্বার্থে এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে তাদের হীন স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবেন। এর ফলে মালিকশ্রেণী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সরকারকে 'ডিসক্রেডিট' (হেয়) করার, সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে সমাবেশ করার সুযোগ আপনারা তুলে দেবেন। আর এইভাবে অন্ধের মতো মালিকদের হাতে একটার পর একটা বিরুদ্ধ আক্রমণের সুযোগ তুলে দিতে থাকলে অবস্থা এমন দাঁড়াতে পারে, যার মোকাবিলা করা এই সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এই সরকার এমন নয় যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

গোড়ায় এই প্রশ্নটি ধরেও আমি আলোচনা করতে পারিনি, অন্যদিকে এসে গিয়েছি জরুরি মনে করে। আপনাদের মনে রাখা দরকার, এই সরকার প্রবল ক্ষমতাবান সর্বক্ষমতাসম্পন্ন একটা 'বডি' নয়। নির্বাচন হলেই আর তার মারফত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই সেই সরকার ইচ্ছামত আইন পাল্টাতে পারবে, সবকিছু করে দিতে পারবে — এটি একটি মিথ্যাচার। এই যেমন, বর্তমান সরকার একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে কী বাধা, তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কী সোরগোল সুরু করেছে! আপনাদের আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছি, বাধা সৃষ্টি ও সোরগোলের এখানেই শেষ নয়। এ সবেমাত্র শুরু, এ ঝড়ের পূর্বাভাস। রাজনীতিতে অভিজ্ঞ লোকমাত্রেই জানেন যে, এ কিছু নয়, এ শুধু দাবার বোড়ের চাল হচ্ছে। ঘোড়ার চাল, গজের চাল এখনও শুরু হয়নি। এসব খেলা শুরু হবে। তখন এ সরকার টিকে থাকবে কি থাকবে না তা নির্ভর করবে একমাত্র গণআন্দোলন, গণচেতনা, জনগণের বিপ্লবী সংঘবদ্ধতার উপর। আপনারা শ্রমিকরা যদি রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন আর ভাবেন যে, সরকার যখন সর্বক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওখানে বসে আছে তখন আপনারা শুধু নিজেদের ইচ্ছেমত আচরণ করে যাবেন আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, মালিকদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলবেন, কিন্তু রাজনীতির যে চক্রান্ত চলছে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র নিজেরা

ওয়াকিবহাল থাকবেন না এবং অপরকে সচেতন করবেন না, তাহলে দেখবেন চোখের সামনে যেকোন দিন মন্ত্রীত্ব পড়ে গেছে, রুখতে পারবেন না। কারণ এ সরকার কিছু নয়। আসল শক্তি হচ্ছে রাষ্ট্র, আসল শক্তি অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাদের হাতে, যারা ব্যাঙ্কিং পরিচালনা করে, শিল্প কারখানা পরিচালনা করে, আর রাষ্ট্রের যারা স্থায়ী 'স্টাফ' অর্থাৎ রাষ্ট্র-কাঠামো।

রাষ্ট্র আর সরকার — বাংলাতেও দু'টো কথা, ইংরেজিতেও দু'টো কথা। সব ভাষাতেই দু'টো কথা — ভাষার সীমাবদ্ধতা না থাকলে। এই দু'টো কথা এই জন্য যে, জিনিস দু'টো আলাদা। রাষ্ট্র বলতে একটা ব্যবস্থা, একটা 'সিস্টেম'কে বোঝায়, আইন-শৃঙ্খলার একটা ধারণা, নীতির একটা ধারণাকে বোঝায়, কতকগুলো মৌলিক অধিকারের একটা ধারণাকে বোঝায় আর তার ভিত্তিতে তাকে রক্ষা করার জন্য আমলাতন্ত্র, প্রশাসনিক বিভাগ, জুডিসিয়ারি এবং সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী — এই সমাবেশ বোঝায়। আর সরকার হচ্ছে আমার ভাষায় তাদের দারোয়ান, একে দেখভাল্ করে। যেমন একটা তাঁতের যন্ত্র। সেটা একটা যন্ত্র, এক নিয়মে কাজ করে। তার ওলটপালট নেই। তার বাঁধুনিটাই এমন যে, একটা বিশেষ নিয়মে এইভাবে সুতো যাবে, এইভাবে কাপড় বেরিয়ে আসবে। একটু ওলটপালট হয়ে গেলেই যন্ত্র বিকল হয়ে যাবে, আবার তাকে মেরামত করতে হবে। কিন্তু তাঁতযন্ত্র যদি ঠিক থাকে তাহলে ঠিক একই নিয়মে সুতো যাবে, একই নিয়মে কাপড় বেরিয়ে আসবে এবং ভাঁজ হবে। তেমনি রাষ্ট্রযন্ত্র হচ্ছে অনেকটা এই তাঁতযন্ত্রের মত। রাষ্ট্রব্যবস্থাটা অনেকটা এইরকম যন্ত্র, আর সরকার হচ্ছে তাঁতি। তা তাঁতি যাকেই করা হোক্ যতক্ষণ তাঁতযন্ত্র থাকবে ততক্ষণ কাপড়ই বুনতে হবে। তাঁতি পরিবর্তনে কী পার্থক্য হয়? না, কাপড় বোনার ব্যাপারে একটা খারাপ তাঁতি, ফাঁকিবাজ তাঁতি হলে ফাঁকি দেয়, বেশি সময় নেয়, অল্প কাপড় বোনে। ভাল তাঁতি হলে অল্প সময়ে বেশি কাপড় বোনে, সুন্দর কাপড় বোনে। আর আছে ব্যক্তিগত ব্যবহার। আমি বলছি যে, সরকার পরিবর্তন হচ্ছে এই তাঁতি পরিবর্তনের মতো। আর রাষ্ট্রের পরিবর্তন, সমাজব্যবস্থা পাল্টানো মানে তাঁত যন্ত্রটাই পাল্টে আর একটা যন্ত্র বসানো। এখন তাঁতটাকে মনে করুন রাষ্ট্রযন্ত্র যে যন্ত্র দিয়ে শোষণ বেরোচ্ছে, আর কাপড়টাকে মনে করে নিন শোষণ। অর্থাৎ আপনাদের ওপর যে অত্যাচার যে জুলুম হচ্ছে — এই জুলুম-অত্যাচারগুলো এই শোষণের যন্ত্রটার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে। পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রটা হচ্ছে এই তাঁতের যন্ত্রটার মতো একটা যন্ত্র যার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত শোষণ বেরোচ্ছে। এই সমাজব্যবস্থা এমন একটা সমাজব্যবস্থা যে বেকারের সৃষ্টি করে, যে ফাটকাবাজির জন্ম দেয়, যে 'অ্যানার্কি এবং 'ক্রাইসিস ইন প্রোডাকশন' অর্থাৎ উৎপাদনে অরাজকতা এবং সঙ্কট এনে ফেলে, বাজার সঙ্কট নিজে সৃষ্টি করে, বাজার মন্দা নিজে সৃষ্টি করে, উৎপাদনের সঙ্কট সৃষ্টি করে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির নামে সঙ্কট সৃষ্টি করে, শুধু মালিকদের মুনাফা বাড়ায়। এবং এইরকম সমাজব্যবস্থাকে দেখবার জন্য উপযুক্ত সংবিধান, আইনকানুন, মিলিটারি, সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ-ব্যুরোক্রেসি, শাসনযন্ত্র এবং বিচার বিভাগ নিয়ে যে কাঠামোটি তা হচ্ছে রাষ্ট্র এবং তাকে আমি বলছি তাঁত। সেইটা একটা তাঁতের মতো, আর সরকার হচ্ছে তাঁতি। তা আমার বক্তব্য তাঁতির ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ ! তাঁতি কি ইচ্ছে করলেই তাঁতযন্ত্র দিয়ে আখ মাড়াতে পারে? ঠিক তেমনি যে কোনও সরকার কি ইচ্ছে করলে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্য দিয়ে সমাজবাদ প্রবর্তন করতে পারে, না জনগণের মুক্তি এনে দিতে পারে, না জনগণের স্বাধীনতা এনে দিতে পারে? পারে না। পারে না বলেই শ্রমজীবী জনসাধারণকে সফল বিপ্লবের আঘাতে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা পাল্টে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। এবং একদিকে নেতৃত্বের এই রাজনৈতিক সংগঠন, অপরদিকে বিপ্লবী গণআন্দোলনগুলি পরিচালনার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের অমোঘ সংঘশক্তি গড়ে তুলতে পারলেই শ্রমজীবী জনসাধারণের 'ইনকিলাবে'র স্বপ্ন একদিন বাস্তবে সফল হবে।

সেই আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তোলাটাই হচ্ছে মূল কথা। সেই আন্দোলন ও সংগঠন অতি দ্রুত গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই 'মজুরদের আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না' — এই নীতি নির্ধারিত হয়েছে, মজুরদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যও নয় বা কোন রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ পার্টি স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেও নয়। কাজেই রাজনৈতিক ঐ উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থে যদি সরকারের এই বৈপ্লবিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণাটিকে শ্রমিকরা অযথা অপব্যবহার করেন তাহলে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারবেন। এই কথাটা শ্রমিকদের মনে রাখা দরকার। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ঘটনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার। একটা কথা কোনমতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ভারতবর্ষের এই সমাজে যতক্ষণ

পর্যন্ত পুঁজিপতিদের অবাধে ব্যবসাবাণিজ্য চালানো এবং পুঁজিবাদী জুলুম ও শোষণের অধিকার অব্যাহত থাকবে ততক্ষণ কোনও মন্ত্রী, কোনও সরকার — তা সে যত আইন প্রবর্তন করুক, যত অধিকার শ্রমিকদের দিক, শ্রমিকদের মুক্তি তার দ্বারা অর্জিত হতে পারে না। একমাত্র পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের সংগঠন গড়ে তুলে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের মুক্তি অর্জিত হতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান সরকারের প্রগতিশীল শ্রমনীতির তাৎপর্যকে বুঝতে হবে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যতক্ষণ এই সরকার আছে, এই শ্রমনীতি আছে, ততক্ষণে দ্রুত শ্রমিকদের নিজেদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে হবে, রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে, সংগঠনকে বিরাট আকারে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে হবে দেশের অভ্যন্তরে। এই একটা সুবর্ণ সুযোগ। আমরা যদি এই সময়ের সদ্ব্যবহার করে সংগঠিত হতে না পারি, জনসাধারণকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে না পারি তাহলে আক্রমণ আবার যখন আসবে তখন আমরা আবার ছত্রখান হয়ে যাব। তখন তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ও দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলবার ক্ষমতা আমাদের থাকবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, শ্রমনীতির এই তাৎপর্য বুঝতে না পেরে সংগঠনের ও জনগণের রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে আন্দোলনের নামে ঠিক উল্‌টো জিনিসটি হচ্ছে। এ একটা অবাক কাণ্ড! অন্যেরা করলেও আপনাদের শ্রমিকদের এইটা একটা অবশ্য দায়িত্ব অপরকে বোঝানো যাতে এই নীতির অপব্যবহার না হয় — যাতে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে, অথবা ইউনিয়নের ক্ষুদ্র স্বার্থে অথবা ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থে এ নীতির সুবিধা কেউ না নেয়। আপনারা একটু ভেবে দেখুন, ঘেরাও যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের আগেও হয়েছে, এমনকী তীব্রতায়ও এর চাইতে বিরাট আকারে হয়েছে। কিন্তু মালিকপক্ষ এই ঘেরাও নিয়ে আগে এত হট্টগোল করেনি। 'ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না'—এই ঘোষণাটির পর থেকেই তারা এত হট্টগোল করছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ঘেরাও নিয়ে যত চিৎকারই তারা করুক, তাদের আক্রমণের আসল লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের এই ঘোষিত নীতিটিকে বানচাল করা।

কাজেই এতবড় একটা ঘোষণা যা মালিকের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে, তা কি একটা ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহৃত হবার জন্য তৈরি হয়েছে? না, এটা তৈরি হয়েছে গোটা পশ্চিম বাংলার শ্রমিক সাধারণকে এই সুযোগে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বৈপ্লবিক চেতনায় সংঘবদ্ধ করে তোলা, গণআন্দোলনগুলিকে উন্নততর করে তোলা এবং লৌহদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে — যাতে কোন সময়ে, কোন ষড়যন্ত্রে এই সরকারকে ভেঙে দেওয়ার যদি চেষ্টা হয় তাহলে সেই সংঘবদ্ধতার জোরে আমরা তাকে রুখতেও পারি। কিন্তু বর্তমানে যা হচ্ছে তাতে কালই যদি আক্রমণ আসে এই সরকারকে ফেলে দেওয়ার, তাহলে দেশের মানুষ দু'দিন রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঢিল-পাটকেল মারতে পারবে, আর কিছু করতে পারবে কি? আর কিছু করার ক্ষমতা আছে কি? সমস্ত শ্রমিকসমাজ — যাদের উপকারের জন্য এতবড় একটা নীতি ঘোষিত হ'ল যদি মালিকদের আক্রমণে, কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণে বা কায়েমি গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ আক্রমণের সামনে এই সরকারকে হটে যেতে হয় তাহলে আজ যে অবস্থায় শ্রমিকসমাজ আছেন তাকে কি তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন? আছে তাঁদের সেই সংগঠন-শক্তি? নেই। দু'দিন বড় জোর রাস্তায় ঢিল-পাটকেল ছোঁড়া হবে, কিন্তু এ ঢিল-পাটকেল-পটকাকে ওরা ভয় পায় না। ওদের সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তি, ওরা তাতে এতটুকু ভয় পায় না। ওরা বরঞ্চ চায়, অসংগঠিত অবস্থায় ঢিল-পাটকেল এবং পটকা ছোঁড়া হোক। তাতে তাদের আরও সুবিধে। কারণ তাহলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে দমন ও নিপীড়নের স্টিমরোলার তারা আরও দৃঢ় হাতে চালাতে পারবে এই সবগুলোর দোহাই দিয়ে, তাদের অত্যাচারী যন্ত্রটাকে আরও শক্তিশালী করতে পারবে। মধ্য সম্প্রদায়ের লোক যারা, মালিক আর মজুরের মাঝখানে সাধারণ মানুষ যারা তাদের এই সমস্ত ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে প্রতিক্রিয়ার দিকে টেনে নিতে সুবিধে হবে। মজুরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে ব্যাপক জনসাধারণ, বাইরের জনসাধারণ থেকে। সেইজন্য এতে ওরা ভয় পায় না।

কিন্তু ভয় পায় ওরা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংযমী শক্তিশালী সংগঠনকে। সে লড়বে যখন, এক ইঞ্চি জমি থেকেও তাকে হঠাতে পারবে না। ঢিল-পাটকেলই হোক আর যা দিয়েই শুরু হোক, সে লড়াই রাস্তায় কতগুলো লোকের বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ নয় — এটা একটা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ। ঢিল-পাটকেল দিয়ে তা শুরু হতে পারে এবং শেষপর্যন্ত সেই লড়াই একেবারে চূড়ান্ত শক্তির মোকাবিলায় যেতে পারে। দৈনন্দিন আন্দোলনগুলো পরিচালনার মধ্য দিয়ে সেইভাবে রাজনৈতিক চেতনাবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলাই হ'ল বর্তমান

শ্রমনীতির তাৎপর্য। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, দেশের শ্রমিকসমাজ সে সম্বন্ধে মোটেই ওয়াকিবহাল নন। শুধু যে শ্রমিকসমাজ ওয়াকিবহাল নন তাই নয়, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা, বিভিন্ন পার্টির নেতা ও কর্মী — যাঁরা ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে পরিচালনা করেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা এই শ্রমনীতিকে খুব 'প্রগতিশীল', 'প্রগতিশীল' বলে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাচ্ছে, তারাও কি 'দ্য ইনার মিনিং, দ্য সিগ্‌নিফিকেন্স, দ্য ট্রিমেন্‌ডাস রেভোলিউশনারি ইম্‌পরটেন্স অব দিস ডিক্লারেশন' (এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, এই প্রগতিশীল নীতির সুদূরপ্রসারী বিরাট বৈপ্লবিক তাৎপর্য) যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন? আমি মনে করি, না। তাঁদের ব্যবহার থেকে মনে হয় তাঁরা বিন্দুমাত্রও এর তাৎপর্য বোঝেননি। তাঁরা শুধু বুঝেছেন কী করে এর থেকে আশু সংকীর্ণ দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করা যায়। এতবড় একটা সুযোগ পূর্বে কখনও দেখা যায়নি, এমনকী কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারও এ জিনিস করতে সক্ষম হয়নি। কোনদিন কেউ আশা করেনি যে, জনসাধারণ যখন ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবে পুলিশ আসতে পারবে না — সরকারের গদিতে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা যতক্ষণ সরকারি গদিতে বসে থাকবেন ততক্ষণ এ জিনিস ঘটতে পারবে না, তাঁরা ঘটতে দেবেন না। এর মানে কি এই দাঁড়ায় — তাঁরা যা করে চলেছেন — যে, অমুক ম্যানেজার এই কথা বলেছে কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘেরাও করা হ'ল। চব্বিশ ঘণ্টা পান থেকে চুন খসতে না খসতে ঘেরাও হচ্ছে বা এমন কিছু হচ্ছে যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে সুযোগ পেয়ে শ্রমিকদের মূল কার্যধারা যেদিকে যাবার কথা — অর্থাৎ শ্রমিকদের সম্মেলন করা, ক্লাস করা, ন্যায্য দাবিগুলোর ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ বড় বড় আন্দোলন গড়ে তোলা, মিটিং গড়ে তোলা, মিছিল করা যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের এই নীতির তাৎপর্য বোঝানো যায়, তা হচ্ছে না। এই শ্রমনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে একদিকে ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন চালানো অথচ উগ্রতা না করা, মালিককে কোন সুযোগ না দেওয়া যাতে এর সুযোগে জনমতকে বিভ্রান্ত করে আইন-শৃঙ্খলার নামে তারা সরকারের প্রগতিশীল নীতিকে বানচাল করে দিতে পারে;আর অন্য দিকে মালিক ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর যে চক্রান্ত চলছে সে সম্বন্ধে রাজনীতির চর্চার দ্বারা সমস্ত মজুর সমাজকে দ্রুত ওয়াকিবহাল করে তোলা, সাজ সাজ রবে সমস্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করা, দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করা, কমিটিতে কমিটিতে সংঘবদ্ধ করা, তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা — আক্রমণ আসছে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে, তাকে রুখতে হবে। আর এখন এই প্রচার করা, সংগঠন করা, ট্রেড ইউনিয়ন করা, মিটিং করা, মিছিল করা, দরকার হলে ধর্মঘট করার অফুরন্ত সুযোগ। এজন্য সুযোগ যে, শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করে বলে পুলিশ তাদের ঘাড়ের উপর এসে চেপে বসতে পারবে না। ঘেরাও পর্যন্ত করতে হবে যখন দরকার, যখন ঘেরাও ছাড়া আর কোনও উপায় নেই মালিককে দিয়ে ন্যায়সঙ্গত দাবিটা মানানোর বা মূল আন্দোলনটাকে রক্ষা করার তখন ঘেরাও করতে হবে, তা প্রচলিত আইনের চোখে আইনসঙ্গত হোক বা না হোক। সেখানেও শ্রমিকরা 'প্রোটেকশন' (সাহায্য) পাবেন, এই হচ্ছে সরকারের পরিষ্কার ঘোষণা। কিন্তু শ্রমিকরা যদি অযথা উগ্র আচরণ করেন, তাদের নিজেদেরই যদি এই রাজনৈতিক ধীশক্তি না থাকে, ধৈর্য না থাকে যে কোন্‌টা উগ্রতা হচ্ছে, কোথায় ব্যক্তিগত স্বার্থে, ক্ষুদ্র স্বার্থে এর ব্যবহার হচ্ছে — এর রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা যদি তাদের মধ্যে খুব ভালভাবে না হয় তাহলে এই প্রগতিশীল শ্রমনীতির সমর্থনে হাততালিতে কোনও কাজ হবে না। কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না, ঈশ্বরও পারবে না। আজ প্রগতিশীল শ্রমনীতির পেছনে হাততালি দেওয়া হচ্ছে, কাল আবার আপনারা হয়ত খেপে গিয়ে একে গালাগালি দিতে সুরু করবেন। চিরকাল ধরে এই দেশে যা হয়ে এসেছে তাই হবে।

আমি 'প্যাট' (তোষামোদ) করা একেবারে পছন্দ করি না। সুড়সুড়ি দেওয়া একদম পছন্দ করি না। সত্য কথা বলছি, ভাল লাগে আপনারা ভাবুন। না বোঝেন, না ভাল লাগে মানবেন না। কিন্তু কথাটা সত্য। কী এদেশে হয়? খুশি হলেই হাততালি। মাথা খাটানো হয় না। কিন্তু একথা সবাই বলে যে, শুধু পেশীতে কাজ হয় না, উত্তেজনায় কাজ হয় না — বুদ্ধি চাই, মগজ চাই। আর এই মগজ হচ্ছে নেতৃত্ব। তাই শ্রমিকসমাজকে ভাবতে হবে, পড়তে হবে, চিন্তা করতে হবে, কাজ করতে করতে দিনরাত রাজনীতির চর্চা করতে হবে। যারা বলে মজুররা রাজনীতি করবে না, মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রাজনীতি ঢোকানো উচিত নয় তারা জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ। তারাও একদল পরজীবী যারা মজুর ইউনিয়ন করে বাড়িঘর করে, মোড়লি করে বেড়ায়, অথবা কর্তৃত্ব করে বেড়ানোই যাদের পেশা এবং নেশা। তারা এই মিথ্যা কথাটা ছড়ায় যে, ট্রেড ইউনিয়নে রাজনীতি ঢুকিও না। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে স্কুল, রাজনীতি শিক্ষার শিবির, মার্কসের ভাষায় — যে মার্কস-

এঙ্গেলস-এর ছবি শ্রমিকেরা টাঙান, সমস্ত লাল ঝান্ডাওয়ালারা টাঙায়। তিনি বলছেন, এই ট্রেড ইউনিয়নগুলো কী? একটা কথায় তিনি তাকে প্রকাশ করেছেন। লড়াই-টড়াই, হাতিয়ার-টাতিয়ার এত কথায় তিনি যানইনি। এ তো আছেই। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে 'স্কুল অব কমিউনিজম' — কমিউনিজমে শিক্ষিত হবার, শিক্ষা গ্রহণ করবার একটা 'ম্যাসিভ' (বিরাট) রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির। এই হ'ল ট্রেড ইউনিয়ন। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে যদি এই শিক্ষাশিবির হিসাবে না দেখা হয়, এগুলো রাজনীতি চর্চার একটা প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে না ওঠে তাহলে এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলো শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অস্ত্রে পর্যবসিত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির বদলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলো শেষপর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ বা সুবিধাবাদের জন্ম দিয়ে থাকে।

অর্থনীতিবাদ বা 'ইকনমিজম', যাকে মজুর আন্দোলনে আমরা এককথায় সুবিধাবাদ বলে থাকি, মজুরদের এই সুবিধাবাদ মালিকদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ আর মজুরের পক্ষে মৃত্যুর সামিল। মজুর খেতে পায় না বলে তার সুবিধাবাদটা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় না — একথাটা মনে রাখা দরকার। মালিক লুট করে বলে তার সুবিধাবাদ তো আরও খারাপ। কিন্তু শ্রমিক খেতে পায় না বলে তার সুবিধাবাদটাও মানবিক বা যুক্তিসঙ্গত হয়ে যায় না। কাজেই মজুরকেও নিজ শ্রেণীস্বার্থেই তার এই অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। মজুরদের বেঁচে থাকতে হলে দাবি মেটানো চাই, তার দাবি আদায়ের জন্য লড়াই দরকার। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এই যদি লড়াইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, আর এই উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েই যদি ইউনিয়ন পরিচালনা করা হয় তাহলে সেসব ইউনিয়নগুলো শুধু সুবিধাবাদী শ্রমিকের জন্ম দেবে। সচেতন, সত্যিকারের দেশ-দরদী, সত্যিকারের বিপ্লবী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, মুক্তিআন্দোলন পরিচালনা করবার যোগ্য শ্রমিকের জন্ম তারা দিতে পারে না। কাজেই শ্রমিক সম্মেলনগুলোকে সেই দিকে নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে, শ্রমিক আন্দোলনকে সেইভাবে পরিচালনা করার দরকার আছে, শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে সেইদিকে পরিচালিত করার দরকার আছে।

অথচ দেখা যায়, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের প্রাত্যহিক ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম কী? মজুররা রোজ 'ইয়ে মাংগ্ ক্যা হ্যায়, উয়ো মাংগ্ ক্যা হ্যায়, ইয়ে রূপেয়া মিলেগা ইয়া নহি, আপ কুছ্ বন্দোবস্ত্ কিজিয়ে' — এরকম বলে। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন কর্তাদের অমুককে ধরে একটা বন্দোবস্ত করে দেবার কথা বলে। মানে তেল দেবার কথা বলে। সোজা কথায় বলে আপনি নাম করা লোক, আপনার প্রভাব আছে, আপনি একটু অমুককে ধরে বন্দোবস্ত করে দিন। এই কথা নেতাকে বলে। আর নেতারাও তাই করে। কারণ নেতারা হচ্ছে, যে যত তেল দিয়ে এরকম ম্যানেজ করে দিতে পারে সেই সবচাইতে বড় নেতা। শ্রমিকদের মধ্যে এরকম ধারণা হয়ে গেছে যে, অমুকের কাছে গিয়ে লাভ নেই। কারণ অমুকের থেকে অমুকের তেল দেওয়ার ক্ষমতা বেশি। ওর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল, ওর ধরাধরির ক্ষমতা বেশি — একথার মানে হ'ল ওর তেল দেওয়ার ক্ষমতা বেশি। কাজেই ওর কাছে গেলে তাদের দাবি মিটে যাবে। এসব মনোভাব কী? এ সুবিধাবাদ নয়? এতে মজুরের নৈতিকতা থাকে? এখানে শ্রমের মর্যাদাবোধ কোথায়? তাহলে বড় বড় কথা, হাততালি, লড়াই, এতসব কথার দরকার কী? যে মজুর শ্রমের মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলে এইরূপ সুবিধাবাদের খপ্পরে পড়েছে, সে মজুর কী করবে? সে মজুর তো মার খাবেই। সে মজুর কি মানুষ? আমি সেই মজুরের পক্ষে যে মজুরের সম্ভ্রমবোধ আছে, যে মজুরের ইজ্জতবোধ আছে, যে মরবে তবু ইজ্জত দেবে না, যে লড়াই করে আদায় করবে, যে সচেতন মজুর। যে দালাল মজুর সে মজুর বলেই তার প্রতি আমার মমতা নেই। একথাটা মনে রাখা দরকার এবং এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া দরকার। তবেই ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের ঊর্ধ্বে শ্রমিকরা উঠতে পারবেন। তবেই শ্রমিকরা এই শ্রমনীতির যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। এই শ্রমনীতির তাৎপর্য হচ্ছে, এ একদিকে যেমন শ্রমিকদের দৈনন্দিন দাবিদাওয়ার আন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়তা করবে, অন্যদিকে এর চেয়ে বড় তাৎপর্য হচ্ছে যে, এই সুযোগে শ্রমিকরা তাদের মনোমতো রাজনৈতিক চর্চার দ্বারা, আন্দোলনের দ্বারা একটা সঠিক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবেন। ফলে সেইটা নিতে হবে, সেইদিকে অনতিবিলম্বে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করতে হবে। জীবনধারণের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই এগুলো তো আছেই — যেমন মলমূত্র ত্যাগ করা আছে, বাজার করা আছে, যেমন ছেলের অসুখ হলে ওষুধের দোকানে দৌড়ানো আছে। অর্থাৎ দাবির প্রশ্ন আছে এবং তা না পেলে লড়াই আছে। কিন্তু তা রাজনীতিকে দূরে ঠেলবে কেন? মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে শ্রমিকদের অনীহা থাকবে কেন? অনিচ্ছা, ঔদাসীন্য থাকবে কেন? একটা

জিনিস প্রায়ই দেখা যায়, রাজনীতির কথা এলেই ঝিমুনি পায়। দেশের কথা, আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেই ঝিমুনি পায়। কিন্তু 'অমুক দাবির কী হবে', 'তার তদ্‌বিরটা ঠিকমত হচ্ছে কিনা', এসব কথা উঠলেই মজুররা খুব চঞ্চ ল হয়ে ওঠে। আপনারাই বলুন, আমি ঠিক বলছি কি না। অথচ এই মনোভাবকে যদি আপনারা দূর না করতে পারেন তাহলে আজ যে মজুর, কাল তার ছেলে আরও খারাপ মজুর, তার ছেলে অর্থাৎ তস্য নাতিটা একেবারে বেকার মজুর, হদ্দ মজুর। জীবনেও সে মুক্তি পাবে না। একবারও কি ভেবেছেন, কী জবাব আপনারা আপনাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে দেবেন? আপনি মজুর, আপনি 'সিভিলাইজেশন'-এর স্রষ্টা, এ সভ্যতার স্রষ্টা। আর এই সভ্যতা মুক্তিবেদনায় কাঁপছে, সে আপনাদের কাছে মুক্তি চাইছে। শুধু আপনাদের মুক্তি নয়, গোটা মানবসভ্যতার মুক্তি আপনাদের হাতে। তার দায়িত্ব শ্রমিকের হাতে। অথচ আপনাদের, শ্রমিকদের সে সম্বন্ধে আজও এতটুকু চেতনা নেই। সেই চেতনা যদি শ্রমিকদের মধ্যে না আসে, সেই চেতনায় শ্রমিকরা যদি উদ্বুদ্ধ না হতে পারেন তাহলে সব ব্যর্থ। তাহলে এর কোনও মানে নেই। কাগজেপত্রে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করার কোনও মানে নেই।

কাজেই আমার সর্বশেষ আবেদন দেশের শ্রমিকভাইদের কাছে — সত্যিকারের বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি আপনাদের গড়তে হবে, নিয়মিত পার্টির কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ নিরুৎসাহকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। হাজার কাজের মধ্যে পড়াশুনা করতে হবে, তর্ক-বিতর্ক আলাপ-আলোচনা করতে হবে, নিয়মিত পার্টির ক্লাসগুলোতে যেতে হবে। এসব সম্পর্কে বিমুখতা যারা প্রকাশ করবে তাদেরই চেপে ধরতে হবে। শ্রমিককে একথা বুঝতেই হবে, আজ যে দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে সে চলছে সেই দুঃসময়ে সে বাঁচতে পারে, দেশকে বাঁচাতে পারে, যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং তার প্রগতিশীল শ্রমনীতিকে বাঁচাতে পারে যদি সে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, সংঘবদ্ধ হয় একটি বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে একটি অটল, সুদৃঢ় হিমালয় পাহাড়ের মতো। আর এদেশে একমাত্র এস ইউ সি আই-ই সত্যিকারের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দল — একথা যেন এক মুহূর্তের জন্যও আপনারা না ভোলেন। এই দলকে আপনাদের চোখের মণির মতো মনে করতে হবে। তাহলে শ্রমিকরা বাঁচবে, দেশও বাঁচবে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকেও কেউ হটাতে পারবে না, তার প্রগতিশীল শ্রমনীতিও থাকবে, আন্দোলনও বাড়তে থাকবে। আর এই আন্দোলনগুলো বাড়তে বাড়তে একদিন পুঁজিবাদকে খতম করা সম্ভব হবে, পুঁজিবাদকে পাল্‌টে মজুরশ্রেণীর রাজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মজুরদের স্বপ্ন একদিন বাস্তবে নিশ্চয় সম্ভব হবে এবং সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়। সর্বশেষে এই সম্মেলনে উপস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকভাইদের প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

১। হিন্দু মৌলবাদী পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) যার থেকে জন্ম নিয়েছে।
২। একটি রক্ষণশীল পার্টি, বর্তমানে যার অস্তিত্ব নেই।

১৪ মে ১৯৬৭ কলকাতার সুবোধ মল্লিক
স্কোয়ারে আয়োজিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।
ইউনিয়ন কর্তৃক ১৯৬৭ সালের ১৫ নভেম্বর
প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত।